সূরা আল-আহযাব:৬ষ্ঠ রুকু (৪১-৫২)আয়াত

Sisters'forum in islam

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يٰۤاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ৩৩ : ৪১

৪১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর,

وَّ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا ৩৩ : ৪২

৪২. এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করার অর্থ হচ্ছে, জীবনের সকল কাজেকর্মে সমস্ত ব্যাপারেই সবসময় যেন মানুষের মুখে আল্লাহর নাম এসে যায়।

(১) যিকর আরবী শব্দ। এর বেশ কয়েকটি অর্থ হতে পারে-(ক) মুখ থেকে যা উচ্চারণ করা হয়।

(খ) অন্তরে কোন কিছু স্মরণ করা। (গ) কোন জিনিস সম্পর্কে সতর্ক করা।

শরী'ঈ পরিভাষায় যিকর হচ্ছে, বান্দা তার রবকে স্মরণ করা। হোক তা তার নাম নিয়ে, গুণ নিয়ে, তার কাজ নিয়ে, প্রশংসা করে, তার কিতাব তিলাওয়াত করে, তার একত্ববাদ ঘোষণা করে, তার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে অথবা তার কাছে কিছু চেয়ে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত এক হাদীসে-কুদসীতে আছে, আল্লাহ্ তাআলা বলেন, বান্দা যে পর্যন্ত আমাকে স্মরণ করতে থাকে বা আমার স্মরণে যে পর্যন্ত তার ঠোঁট নড়তে থাকে, সে পর্যন্ত আমি তার সাথে থাকি। [বুখারীঃ ৭৪০৫]

আর আপনি আপনার রবকে নিজ মনে স্মরণ করুন সবিনয়ে, সশংকচিত্তে ও অনুচ্চস্বরে, সকালে ও সন্ধ্যায়। আর উদাসীনদের অন্তভুক্ত হবেন না। আরাফঃ ২০৫

মানুষের মনে আল্লাহর চিন্তা পুরোপুরি ও সর্বব্যাপী আসন গেঁড়ে না বসা পর্যন্ত এ ধরনের অবস্থা তার মধ্যে সৃষ্টি হয় না। মানুষের চেতনার জগত অতিক্রম করে যখন অচেতন মনের গভীরদেশেও এ চিন্তা বিস্তৃত হয়ে যায় তখনই তার অবস্থা এমন হয় যে, সে কোন কথা বললে বা কোন কাজ করলে তার মধ্যে আল্লাহর নাম অবশ্যই এসে যাবে। আহার করলে "বিসমিল্লাহ" বলে শুরু করবে। আহার শেষ করবে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে। আল্লাহকে স্মরণ করে ঘুমাবে এবং ঘুম ভাঙবে আল্লাহর নাম নিতে নিতে। কথাবার্তায় তার মুখে বারবার বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ এবং এ ধরনের অন্য শব্দ ও বাক্য বারবার

উচ্চারিত হতে থাকবে। প্রত্যেক ব্যাপারে বারবার সে আল্লাহর সাহায্য চাইবে। প্রত্যেকটি নিয়ামত লাভ করার পর আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। প্রত্যেকটি বিপদ আসার পর তাঁর রহমতের প্রত্যাশী হবে। প্রত্যেক সংকটে তাঁর দিকে মুখ ফিরাবে। কোন খারাপ কাজের সুযোগ এলে তাঁকে ভয় করবে। কোন ভুল বা অপরাধ করলে তাঁর কাছে মাফ চাইবে। প্রত্যেকটি প্রয়োজন ও অভাবের মুহূর্তে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে।

মোটকথা উঠতে বসতে এবং দুনিয়ার সমস্ত কাজকর্মে আল্লাহর স্মরণ হয়ে থাকবে তার কণ্ঠলগ্ন। এ জিনিসটি আসলে ইসলামী জীবনের প্রাণ। অন্য যে কোন ইবাদাতের জন্য কোন না কোন সময় নির্ধারিত থাকে এবং তখনই তা পালন করা হয়ে থাকে এবং তা পালন করার পর মানুষ তা থেকে আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু এ ইবাদাতটি সর্বক্ষণ জারী থাকে এবং এটিই আল্লাহ ও তাঁর বন্দেগীর সাথে মানুষের জীবনের স্থায়ী সম্পর্ক জুড়ে রাখে। মানুষের মন কেবলমাত্র এসব বিশেষ কাজের সময়েই নয় বরং সর্বক্ষণ আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট এবং তার কণ্ঠ সর্বক্ষণ তাঁর স্মরণে সিক্ত থাকলেই এরই মাধ্যমেই ইবাদাত ও অন্যান্য দ্বীনী কাজে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। মানুষের মধ্যে যদি এ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহলে তার জীবনে ইবাদাতও দ্বীনী কাজ ঠিক তেমনিভাবে বুদ্ধি ও বিকাশ লাভ করে যেমন একটি চারাগাছকে তার প্রকৃতির অনুকূল আবহাওয়ায় রোপণ করা হলে তা বেড়ে উঠে। পক্ষান্তরে যে জীবন আল্লাহর এ সার্বক্ষণিক স্মরণ শূন্য থাকে সেখানে নিছক বিশেষ সময়ে অথবা বিশেষ সুযোগে অনুষ্ঠিত ইবাদাত ও দ্বীনী কাজের দৃষ্টান্ত এমন একটি চারাগাছের মতো যাকে তার প্রকৃতির প্রতিকূল আবহাওয়ায় রোপণ করা হয় এবং নিছক বাগানের মালির বিশেষ তত্ত্বাবধানের কারণে বেঁচে থাকে। একথাটিই নবী ﷺ একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ

“মু’ আয ইবনে আনাস জুহানী বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রসূল! জিহাদকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রতিদান লাভ করবে কে? জবাব দিলেন, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে স্মরণ করবে। তিনি নিবেদন করেন, রোযা পালনকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রতিদান পাবে কে? জবাব দিলেন, যে তাদের মধ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী স্মরণ করবে। আবার তিনি একই ভাবে নামায, যাকাত, হ্জ্জ ও সাদকা আদায়কারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। জবাবে নবী করীম ﷺ বলেন, “যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী স্মরণ করে।” (মুসনাদে আহমাদ)

মুসলমানদেরকে এ উপদেশ দেয়াই এর উদ্দেশ্য যে, যখন শত্রুদের পক্ষ থেকে আল্লাহর রসূলের প্রতি ব্যাপকভাবে বিদ্রূপ ও নিন্দাবাদ করা হয় এবং আল্লাহর সত্য দ্বীনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য রসূলের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের তুফান সৃষ্টি করা হয় তখন নিশ্চিন্তে এসব বাজে খিস্তি খেউড় শুনতে থাকা, নিজেই শত্রুদের ছাড়নো সন্দেহ সংশয়ে জড়িয়ে পড়া এবং জবাবে তাদেরকেও গালাগালি করতে থাকা মু’ মিনদের কাজ নয়। বরং তাদের কাজ হচ্ছে, সাধারণ দিনগুলোর তুলনায় এসব দিনে বিশেষভাবে আল্লাহকে আরো বেশী করে স্মরণ করা। সকাল সাঁঝে আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করার অর্থ হচ্ছে সর্বক্ষণ তাঁর তাসবীহ করা। আর তাসবীহ করা মানে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা, নিছক তাসবীহর দানা হাতে নিয়ে গুণতে থাকা নয়।

আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা আল্লাহর কাছে কতটা মর্যাদার! ক্ষুদ্র এক বান্দা যদি আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লাহ এর কতটা মূল্য দেন! আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন মাজীদে বলছেন-

فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ۔

তোমরা আমাকে স্মরণ করো; আমিও তোমাদের স্মরণ করব। –সূরা বাকারা : ১৫২

মহান আল্লাহর এক নাম হল- لشَّكُوْر গুণগ্রাহী- তিনি মানুষের ছোট্ট ছোট্ট কাজেরও মূল্য দিয়ে থাকেন। হাদীসে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বান্দা সম্পর্কে বলেন- وَأَنَا مَعَه إِذَا ذَكَرَنِي۰

যখন সে আমাকে স্মরণ করে, আমি তো তখন তার সঙ্গেই থাকি।

إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِه، ذَكَرْتُه فِي نَفْسِي۰

বান্দা যদি মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও মনে মনে তাকে স্মরণ করি।

وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ، ذَكَرْتُه فِي مَلَإٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ۰

যদি সে লোক সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, আমিও এমন সমাবেশে তাকে স্মরণ করি, যা তার সমাবেশের চেয়ে উৎকৃষ্ট। –সহীহ বুখারী, ৭৪০৫; সহীহ মুসলিম, ২৬৭৫

সব পেরেশানীর ওষুধ, সব দুঃখ-কষ্টের ওষুধ- আল্লাহকে স্মরণ করা। বিপদে পড়ে, কষ্টে পড়ে যদি আল্লাহকে স্মরণ করা যায়- আল্লাহ!۰رَبِّ اَنِّیۡ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَاَنۡتَ اَرۡحَمُ الرّٰحِمِیۡنَ আল্লাহ! আমাকে তো কষ্ট স্পর্শ করেছে, আমি কষ্টে পড়ে গেছি।

হযরত আইয়ূব আলাইহিস সালাম এটা বলেছিলেন। যে কোনো ব্যক্তিই যদি কোনো কষ্টে পড়ে যায়, আর সে ডাকে- `আল্লাহ!` সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সাড়া দিয়ে দেন। আল্লাহ বলেন-

اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَ لْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ۰

কেউ যখন আমাকে ডাকে, আমি তার ডাক শুনি, সুতরাং তারাও আমার কথা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করুক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে এসে যায়। –সূরা বাকারা : ১৮৬

কাজেই কোনো দুঃখ-কষ্টে কেউ যদি আল্লাহকে ডাকে, আল্লাহ অবশ্যই সাড়া দেন আর তার মনের দুঃখ-কষ্ট সব দূর করে দেন।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের মন প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই মন প্রশান্ত হয়। সূরা রাদঃ২৮

هُوَ الَّذِیۡ یُصَلِّیۡ عَلَیۡکُمۡ وَ مَلٰٓئِکَتُهٗ لِیُخۡرِجَکُمۡ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوۡرِ ؕ وَ کَانَ بِالۡمُؤۡمِنِیۡنَ رَحِیۡمًا ৩৩ : ৪৩

৪৩. তিনিই যিনি তোমাদের প্রশংসা করেন এবং দো'আ ও ক্ষমা চান তোমাদের জন্য তাঁর ফিরিশতাগণ; যেন তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আনেন আলোর দিকে। আর তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু।

‘সালাত’ শব্দটি যখন আল্লাহর ক্ষেত্রে বান্দাদের জন্য ব্যবহার করা হয় তখন এর অর্থ হয় রহমত, অনুগ্রহ। আর যখন এটি ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে মানুষের জন্য ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ হয় দো’আ, ইসতিগফার। [ফাতহুল কাদীর]

অনুগ্রহের ভাব প্রকাশ করার জন্য মূলে সালাত (يصلى-صلوة) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। “সালাত” শব্দটি যখন আরো (على)অব্যয় সহকারে আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্য ব্যবহার করা হয় তখন এর অর্থ হয় রহমত, অনুগ্রহ, করুণা ও স্নেহশীষ।

মুসলমানদের মনে এ অনুভূতি সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য যে, কাফের ও মুনাফিকদের মনের সমস্ত জ্বালা ও আক্রোশের কারণ হচ্ছে আল্লাহর রহমত, যা তাঁর রসূলের বদৌলতে তোমাদের ওপর বর্ষিত হয়েছে। এরই মাধ্যমে তোমরা ঈমানী সম্পদ লাভ করেছো, কুফরী ও জাহেলিয়াতের অন্ধকার ভেদ করে ইসলামের আলোকে চলে এসেছো এবং তোমাদের মধ্যে এমন উন্নত নৈতিক বৃত্তি ও গুণাবলীর সৃষ্টি হয়েছে যেগুলোর কারণে অন্যদের থেকে তোমাদের সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিভাত হচ্ছে। হিংসুটেরা রসূলের ওপর এরই ঝাল ঝাড়ছে। এ অবস্থায় এমন কোন নীতি অবলম্বন করো না যার ফলে তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাও।

ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে মানুষের জন্য এই মর্মে দোয়া করে যে, হে আল্লাহ, তুমি এদের প্রতি অনুগ্রহ করো এবং তোমার দানে এদেরকে আপ্লুত করে দাও। এভাবে يُصَلِّي عَلَيْكُمْ এর অর্থ এও হয় যে, يشيع عنكم الذكر الجميل فى عباد الله অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে তোমাদেরকে খ্যাতি দান করেন এবং এমন পর্যায়ে উন্নীত করেন যার ফলে আল্লাহর সমুদয় সৃষ্টি তোমাদের প্রশংসা করতে থাকে এবং ফেরেশতারা তোমাদের প্রশংসা ও সুনামের আলোচনা করতে থাকে।

- <u>ফেরেশতাদের মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা:</u> "যারা আরশ বহন করছে এবং যারা এর চারপাশে রয়েছে, তারা তাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাঁর প্রতি ঈমান রাখে। আর তারা মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, ‘হে আমাদের রব, আপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। অতএব যারা তওবা করে এবং আপনার পথ অনুসরণ করে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন’ ।"— সূরা গাফির (মুমিন), আয়াত: ৭
- <u>অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনা:</u> "আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফরি করে,তাদের অভিভাবক হলো তাগুত, তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়।" সূরা আল-বাকারাহ,: ২৫৭

তিনিই তাঁর বান্দার ওপর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেন, যাতে তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু, অতি দয়াবান।"সূরা আল-হাদীদ: ৯

- আল্লাহর রহমত ও ফেরেশতাদের দোআ (প্রথম কাতারের মুসল্লি ও দ্বীন শিক্ষার্থীদের জন্য): রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ দোআ করেন তাদের জন্য, যারা প্রথম কাতারে (সালাত আদায়ের জন্য) দাঁড়ায়।"— সুনানে আবু দাউদ: ৬৬৪
- দ্বীন ও জ্ঞানের মজলিসে ফেরেশতাদের রহমত: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যখন কোনো দল আল্লাহর ঘরসমূহের কোনো ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পরস্পরের মধ্যে তা নিয়ে আলোচনা করে, তখন তাদের ওপর শান্তি অবতীর্ণ হয়, আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয়, ফেরেশতারা তাদেরকে বেষ্টন করে রাখে এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের কাছে তাদের কথা আলোচনা (প্রশংসা) করেন।"— সহীহ মুসলিম: ২৬৯৯
- মুমিনদের প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা ও ফেরেশতাদের ঘোষণা: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন জিবরীল (আ.)-কে ডেকে বলেন, 'আমি অমুককে ভালোবাসি, তাই তুমিও তাকে ভালোবাসো।' অতঃপর জিবরীল (আ.) তাকে ভালোবাসেন এবং আসমানবাসীদের (ফেরেশতাদের) মাঝে ঘোষণা করে দেন যে, 'আল্লাহ অমুককে ভালোবাসেন, সুতরাং তোমরাও তাকে ভালোবাসো।' তখন আসমানের সকল ফেরেশতা তাকে ভালোবাসতে শুরু করে। এরপর জমিনেও তার জন্য مقبولیت বা গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে দেওয়া হয়।"— সহীহ বুখারী, হাদীস: ৩২০৯

تَحِيَّتُهُمۡ يَوۡمَ يَلۡقَوۡنَهٗ سَلٰمٌ ۖۚ وَ اَعَدَّ لَهُمۡ اَجۡرًا كَرِيۡمًا ৩৩ : ৪৪

৪৪. যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে, সেদিন তাদের অভিবাদন হবে সালাম। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন সম্মানজনক প্রতিদান।

মূলে বলা হয়েছেঃ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ "তার সাথে মোলাকাতের সময় সেদিন তাদের অভ্যর্থনা হবে সালাম" এর তিনটি অর্থ হতে পারে।

এক, আল্লাহ নিজেই "আসসালামু আলাইকুম" বলে তাদেরকে অভ্যর্থনা করবেন। যেমন সূরা ইয়াসীন--এর ৫৮ আয়াত বলা হয়েছেঃ ৩৬ : ৫৮ سَلٰمٌ ۟ قَوۡلًا مِّنۡ رَّبٍّ رَّحِيۡمٍ পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম' (শান্তি)।

দুই, ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম করবে। যেমন সূরা নাহলে বলা হয়েছেঃ

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"ফেরেশতারা যাদের রূহ কবয করবে এমন অবস্থায় যখন তারা পবিত্র লোক ছিল, তাদেরকে তারা বলবে, শান্তি ও নিরাপত্তা হোক তোমাদের প্রতি, প্রবেশ করো জান্নাতে তোমাদের সৎকাজসমূহের বদৌলতে, যা তোমরা দুনিয়ায় করতে।" সূরা নাহল (৩২ আয়াত)

তিন, তারা নিজেরাই পরস্পরকে সালাম করবে। সূরা ইউনুসে বলা হয়েছেঃ

دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"সেখানে তাদের আওয়াজ হবে, হে আল্লাহ! পবিত্র তোমার সত্তা, তাদের অভ্যর্থনা হবে 'সালাম' এবং তাদের কথা শেষ হবে এ বাক্য দিয়ে যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের জন্যই। সূরা ইউনুসঃ১০)

আয়াতে বলা হয়েছেঃ "তার সাথে মোলাকাতের সময় সেদিন তাদের অভ্যর্থনা হবে সালাম" । অর্থাৎ যেদিন আল্লাহ তা'আলার সাথে এদের সাক্ষাত ঘটবে-তখন তাঁর পক্ষ থেকে এদেরকে সালাম বা আসসালামু আলাইকুমের মাধ্যমে সম্ভাষণ জানানো হবে। এখন প্রশ্ন হলো, এ সালাম কখন দেয়া হবে? এর উত্তরে বিভিন্ন সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে।

অধিকাংশের মতে, এখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম দেয়ার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এ সালাম মুমিনগণের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় বা হবে।

ইমাম রাগেব প্রমূখের মতে, আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের দিন হলো আখেরাতের দিন।

আবার কোন কোন তাফসীরকারকের মতে এ সাক্ষাতের সময় হলো জান্নাতে প্রবেশকাল যেখানে তাদের প্রতি আল্লাহ ও ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে সালাম পৌছানো হবে।

আবার কোন কোন মুফাসসির মৃত্যু দিবসকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের দিন বলে মন্তব্য করেছেন। সেদিন সমগ্র বিশ্বের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ সমীপে উপস্থিত হওয়ার দিন।

আবার কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে, এ সালাম মুমিনগণ পরস্পর পরস্পরকে প্রদান করবে। [দেখুন: ইবন কাসীর, ফাতহুল কাদীর]

জান্নাতে মুমিনদের পারস্পরিক ও ফেরেশতাদের অভিবাদন

"دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۚ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ। সেখানে তাদের প্রার্থনা হবে, 'হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র' এবং সেখানে তাদের পারস্পরিক অভিবাদন হবে 'সালাম' আর তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি হবে এই বলে, 'সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর। সূরা ইউনুস:১০

ফেরেশতারা জান্নাতিদের স্বাগত জানাবে।..

এবং..."وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ۞ سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ.
ফেরেশতারা প্রতিটি দরজা দিয়ে তাদের নিকট প্রবেশ করবে (এবং বলবে), 'তোমাদের ধৈর্যধারণের কারণে তোমাদের ওপর শান্তি (সালাম) বর্ষিত হোক, আর পরকালের এই পরিণাম কতই না চমৎকার!' "সূরা আর-রাদ (১৩:২৩-২৪):

সম্মানজনক প্রতিদান ও সালামের কথা

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا

"তাদেরকে তাদের ধৈর্যের প্রতিদানস্বরূপ জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ দেওয়া হবে এবং সেখানে তাদেরকে অভিবাদন ও সালাম সহকারে স্বাগত জানানো হবে।" ফুরকান (২৫:৭৫)

আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ ও সালামের আনন্দ: হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:"জান্নাতিরা যখন তাদের নেয়ামতের মধ্যে ডুবে থাকবে, হঠাৎ তাদের ওপর একটি নূর (আলো) চমকে উঠবে। তারা মাথা তুলে দেখবে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর থেকে উঁকি দিয়ে দেখছেন। আল্লাহ বলবেন, 'হে জান্নাতিরা! তোমাদের প্রতি শান্তি (সালাম) বর্ষিত হোক।' আর এটিই হলো আল্লাহর বাণী: 'পরম দয়ালু পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে সালাম' (সূরা ইয়াছিন: ৫৮)। এরপর আল্লাহ তাদের দিকে তাকাবেন এবং তারাও আল্লাহর দিকে তাকাবে। যতক্ষণ তারা আল্লাহর দীদার লাভ করবে, ততক্ষণ অন্য কোনো নেয়ামতের দিকে মনোযোগ দেবে না।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নম্বর: ১৮৪)

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّاۤ اَرۡسَلۡنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيۡرًا ৪৫ : ৩৩

৪৫. হে নবী! অবশ্যই আমরা আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে

وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذۡنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيۡرًا ৪৬ : ৩৩

৪৬. এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তার দিকে আহবানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।

নবীকে সাক্ষী করার অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। তিন ধরনের সাক্ষ্য প্রদান এর অন্তর্ভুক্তঃ

একঃ মৌখিক সাক্ষ্যদান। অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীন যেসব সত্য ও মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নবী তার সত্যতার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন এবং দুনিয়াবাসীকে পরিষ্কার বলে দেবেন, এটিই সত্য এবং এর বিরুদ্ধে যা কিছু আছে সবই মিথ্যা। আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ব, ফেরেশতাদের অস্তিত্ব, অহী নাযিল হওয়া, মৃত্যু পরবর্তী জীবনের অনিবার্যতা এবং জান্নাত ও জাহান্নামের প্রকাশ, দুনিয়া বাসীদের কাছে যতই অদ্ভূত মনে হোক না কেন এবং তারা একথাগুলোর বক্তাকে যতই বিদ্রূপ করুক বা তাকে পাগল বলুক না কেন, নবী কারো পরোয়া না করেই দাঁড়িয়ে যাবেন এবং সোচ্চার কন্ঠে বলে দেবেন, এসব কিছুই সত্য এবং যারা এসব মানে না তারা পথভ্রষ্ট। এভাবে নৈতিকতা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির যে ধারণা, মূল্যবোধ, মূলনীতি ও বিধান আল্লাহ তাঁর সামনে

সুস্পষ্ট করেছেন সেগুলোকে সারা দুনিয়ার মানুষ মিথ্যা বললেও এবং তারা তার বিপরীত পথে চললেও নবীর কাজ হচ্ছে সেগুলোকেই প্রকাশ্য জনসম্মুখে পেশ করবেন এবং দুনিয়ায় প্রচলিত তার বিরোধী যাবতীয় পদ্ধতিকে ভ্রান্ত ঘোষণা করবেন। অনুরূপভাবে আল্লাহর শরীয়াতে যা কিছু হালাল সারা দুনিয়া তাকে হারাম মনে করলেও নবী তাকে হালালই বলবেন। আর আল্লাহর শরীয়াতে যা হারাম সারা দুনিয়া তাকে হালাল ও ভালো গণ্য করলেও নবী তাকে হারামই বলবেন।

দুইঃ কর্মের সাক্ষ্য। অর্থাৎ দুনিয়ার সামনে যে মতবাদ পেশ করার জন্য নবীর আবির্ভাব হয়েছে তিনি নিজের জীবনের সমগ্র কার্মকান্ডের মাধ্যমে তার প্রদর্শনী করবেন। যে জিনিসকে তিনি মন্দ বলেন তাঁর জীবন তার সকল প্রকার গন্ধমুক্ত হবে। যে জিনিসকে তিনি ভালো বলেন তাঁর চরিত্রে তা পূর্ণমাত্রায় দেদীপ্যমান হবে। যে জিনিসকে তিনি ফরয বলেন তা পালন করার ক্ষেত্রে তিনি সবচেয়ে অগ্রণী হবেন। যে জিনিসকে তিনি গোনাহ বলেন তা থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে কেউ তাঁর সমান হবে না। যে জীবন বিধানকে তিনি আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান বলেন তাকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে তিনি কোন প্রচেষ্টার ত্রুটি করবেন না। তিনি নিজের দাওয়াতে ব্যাপারে কতটা সত্যনিষ্ঠ ও আন্তরিকতা তাঁর নিজের চরিত্র ও কার্যধারাই সাক্ষ্য দেবে। তাঁর সত্তা তাঁর শিক্ষার এমন মূর্তিমান আদর্শ হবে, যা দেখে প্রত্যেক ব্যক্তি জানবে, যে দ্বীনের দিকে তিনি দুনিয়াবাসীকে আহবান জানাচ্ছেন তা কোন্ মানের মানুষ তৈরি করতে চায়, কোন্ ধরনের চরিত্র সৃষ্টি তার লক্ষ্য এবং তার সাহায্যে সে কোন্ ধরনের জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা করে।

তিনঃ পরকালীন সাক্ষ্য। অর্থাৎ আখেরাতে যখন আল্লাহর আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে তখন নবী এ মর্মে সাক্ষ্য দেবেন, তাঁকে যে পয়গাম দেয়া হয়েছিল তা তিনি কোন প্রকার কাটছাঁট ও কমবেশী না করে হুবহু মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের সামনে নিজের কথা ও কর্মের মাধ্যমে সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার ব্যাপারে সামান্যতম ত্রুটি করেননি। এ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তাঁর বাণী মান্যকারী কি পুরস্কার পাবে এবং অমান্যকারী কোন্ ধরনের শাস্তির অধিকারী হবে তার ফায়সালা করা হবে।

এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে, নবী ﷺ কে সাক্ষ্যদানের পর্যায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তাঁর প্রতি কত বড় দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন এবং এত উচ্চ স্থানে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য কত মহান ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন। একথা স্পষ্ট, কথা ও কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর সত্য দ্বীনের সাক্ষ্য প্রদান করার ক্ষেত্রে নবী ﷺ এর তিল পরিমাণও ত্রুটি হয়নি। তবেই তো তিনি আখেরাতে এই মর্মে সাক্ষ্য দিতে পারবেন, “আমি লোকদের সামনে সত্যকে পুরোপুরি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলাম।” আর তবেই তো আল্লাহর প্রমাণ (হুজ্জাত) লোকদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

অন্যথায় যদি সাক্ষ্য দেবার ব্যাপারে এখানে নাউযুবিল্লাহ তাঁর কোন ত্রুটি থেকে যায়, তাহলে না তিনি আখেরাতে তাদের জন্য সাক্ষী হতে পারবেন আর না সত্য অমান্যকারীদের অপরাধ সত্য প্রমাণিত হতে পারবে।

কেউ কেউ এ সাক্ষ্যদানকে এ অর্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন যে, নবী ﷺ আখেরাতে লোকদের কাজের ওপর সাক্ষ্য দেবেন এবং এ থেকে তারা একথা প্রমাণ করেন যে, নবী করীম ﷺ সকল মানুষের কার্যক্রম দেখছেন অন্যথায় না দেখে কেমন করে সাক্ষ্য দিতে পারবেন? কিন্তু কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে এ ব্যাখ্যা একবারেই ভ্রান্ত। কুরআন আমাদের বলে, লোকদের কার্যক্রমের ওপর সাক্ষ্য কায়েম করার জন্য তো আল্লাহ অন্য একটি ব্যবস্থা করেছেন। এ উদ্দেশ্যে তাঁর ফেরেশতারা প্রত্যেক ব্যক্তির আমলনামা তৈরি করছে। (দেখুন সূরা কাফ ১৭-১৮ আয়াত এবং আল কাহ্‌ফ ১৪৯ আয়াত) আর এজন্য তিনি মানুষের নিজের অংগ-প্রত্যংগেরও সাক্ষ্য নেবেন। (সূরা ইয়াসীন, ৬৫; হা মীম আস্ সাজদাহ, ২০-২১) বাকী রইলো নবীগণের ব্যাপার। আসলে নবীগণের কাজ বান্দাদের কার্যক্রমের ওপর সাক্ষ্য দেয়া নয় বরং বান্দাদের কাছে যে সত্য পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছিল, সে বিষয়ে তারা সাক্ষ্য দেবেন। কুরআন পরিষ্কার বলেঃ

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

"যেদিন আল্লাহ সমস্ত রসূলকে সমবেত করবেন তারপর জিজ্ঞেস করবেন; তোমাদের দাওয়াতের কি জবাব দেয়া হয়েছিল? তখন তারা বলবে, আমাদের কিছুই জানা নেই। সমস্ত অজ্ঞাত ও অজানা কথাতো একমাত্র তুমিই জানো।' (আল মা-য়েদাহ, ১০৯)

আর এ প্রসঙ্গে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে কুরআন বলে, যখন তাঁকে ঈসায়ীদের গোমরাহী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে তখন তিনি বলবেনঃ

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ

"আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন পর্যন্ত তাদের ওপর সাক্ষী ছিলাম। যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন তখন আপনিই তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।" (আল মা-য়েদাহ, ১১৭)

নবীগন যে মানুষের কাজের ব্যাপারে সাক্ষী হবেন না এ সম্পর্কে এ আয়াতটি একেবারেই সুস্পষ্ট। তাহলে তাঁরা সাক্ষী হবেন কোন্ জিনিসের? এর পরিষ্কার জবাব কুরআন এভাবে দিয়েছেঃ

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

আর হে মুসলমানগণ! এভাবে আমি তোমাদেরকে করেছি একটি মধ্যপন্থী উম্মাত, যাতে তোমরা লোকদের ওপর সাক্ষী হবে এবং রসূল তোমাদের ওপর সাক্ষী হন।" (আল বাকারাহ, ১৪৩)

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ

"আর যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন সাক্ষী উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবো, যে তাদের ওপর সাক্ষ্য দেবে এবং (হে মুহাম্মাদ) তোমাকে এদের ওপর সাক্ষী হিসেবে নিয়ে আসবো।" (আন নাহল, ৮৯)

এ থেকে জানা যায়, কিয়ামতের দিন নবী ﷺ এর উম্মাতকে এবং প্রত্যেক উম্মাতের ওপর সাক্ষ্যদানকারী সাক্ষীদেরকে যে ধরনের সাক্ষ্যদান করার জন্য ডাকা হবে নবী ﷺ এর সাক্ষ্য তা থেকে ভিন্ন ধরনের হবে না। একথা সুস্পষ্ট যে, এটা যদি কার্যাবলীর সাক্ষ্যদান হয়ে থাকে, তাহলে সে সবের উপস্থিত ও দৃশ্যমান হওয়াও অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। আর মানুষের কাছে তার স্রষ্টার পয়গাম পৌঁছে গিয়েছিল কিনা কেবল এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয়ার জন্য যদি এ সাক্ষীদেরকে ডাকা হয়, তাহলে অবশ্যই নবী করীমকেও ﷺ এ উদ্দেশ্যেই পেশ করা হবে।

বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও ইমাম আহমাদ প্রমুখগণ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবুদ দারদা, আনাস ইবনে মালেক ও অন্যান্য বহু সাহাবা থেকে যে হাদীসগুলো উদ্ধৃত করেছেন সেগুলোও এ বিষয়বস্তুর সমর্থক।

সেগুলোর সম্মিলিত বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ নবী ﷺ কিয়ামতের দিন দেখবেন তাঁর কিছু সাহাবীকে আনা হচ্ছে কিন্তু তারা তাঁর দিকে না এসে অন্যদিকে যাচ্ছে অথবা তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে অন্য দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। নবী করীম ﷺ তাদেরকে দেখে নিবেদন করবেন, হে আল্লাহ! এরা তো আমার সাহাবী। একথায় আল্লাহ বলবেন, তুমি জানো না তোমার পর এরা কি সব কাজ করেছে। এ বিষয়বস্তুটি এত বিপুল সংখ্যক সাহাবী থেকে এত বিপুল সংখ্যক সনদ সহকারে বর্ণিত হয়েছে যে, এর নির্ভুলতায় সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশ নেই। আর এ থেকে একথাও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী ﷺ নিজের উম্মাতের প্রত্যেক ব্যক্তির এবং তার প্রত্যেকটি কাজের দর্শক মোটেই নন। তবে যে হাদীসে বলা হয়েছে যে, নবী (সা.) এর সামনে তাঁর উম্মাতের কার্যাবলী পেশ করা হয়ে থাকে সেটি কোনক্রমেই এর সাথে সংঘর্ষশীল নয়। কারণ তার মূল বক্তব্য শুধুমাত্র এতটুকু যে, মহান আল্লাহ নবী করীমকে ﷺ তাঁর উম্মাতের কার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত রাখেন। তার এ অর্থ কোথা থেকে পাওয়া যায় যে, তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির কার্যকলাপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করছেন?

'মুবাশ্‌শির' এর মর্মার্থ এই যে, তিনি স্বীয় উম্মতের মধ্য থেকে সৎ ও শরীয়তানুসারী ব্যক্তিবর্গকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন এবং 'নাযির' অর্থাৎ, তিনি অবাধ্য ও নীতিচ্যুত ব্যক্তিবর্গকে আযাব ও শাস্তির ভয়ও প্রদর্শন করেন। [তাবারী, বাগভী]

অনেকে ‘شاهد’ এর অর্থ হাযের-নাযের (সর্বস্থলে উপস্থিত ও দর্শক) করে থাকেন; যা কুরআনের অর্থ-বিকৃতির নামান্তর। নবী (সাঃ) আপন উম্মতের জন্য সাক্ষ্য দেবেন, তাদের জন্যও সাক্ষ্য দেবেন যাঁরা তাঁর উপর ঈমান এনেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধেও যারা তাঁকে মিথ্যা মনে করেছে। কিয়ামতের দিন তিনি মু' মিনদেরকে তাদের ওযুর উজ্জ্বল স্থান দেখে চিনতে পারবেন। অনুরূপ তিনি অন্যান্য নবীদের জন্য সাক্ষ্য দেবেন যে, তাঁরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দিয়েছিলেন। এ সাক্ষ্য আল্লাহর দেওয়া সুনিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে হবে। এই কারণে নয় যে, তিনি সকল আম্বিয়াগণ (ও তাঁদের কার্যকলাপ)-কে স্বচক্ষে দর্শন করতেন। বলা বাহুল্য, এই বিশ্বাস কুরআনী দলীলের পরিপন্থী

(وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ) এর অর্থ তিনি উম্মতকে আল্লাহর সত্তা ও অস্তিত্ব এবং তাঁর আনুগত্যের প্রতি আহ্বানকারী। আয়াতে بِإِذْنِهِ শব্দ এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করায় বোঝা যায় যে, তিনি মানবমণ্ডলীকে আল্লাহর দিকে তাঁর অনুমতি সাপেক্ষেই আহবান করেন। [কুরতুবী, সাদী, বাগভী]

আয়াতে (وَسِرَاجًا مُنِيرًا) এর মর্মার্থ ‘পবিত্র কুরআন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। [ইবন কাসীর; কুরতুবী]

যেমন প্রদীপ দ্বারা অন্ধকার দূর হয়, অনুরূপ নবী (সাঃ) দ্বারা কুফর ও শিরকের অন্ধকার দূর হয়েছে। এ ছাড়া বর্তমানেও যে এ প্রদীপের আলোয় আলোকিত হয়ে পরিপূর্ণতা ও চিরসুখ লাভে ধন্য হতে চায়, সেও তা অর্জন করতে পারবে। কারণ তাঁর নবুঅতের এই প্রদীপ কিয়ামত পর্যন্ত দেদীপ্যমান থাকবে।

সূরা আল-আহযাবের ৪৫ ও ৪৬ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যে ৫টি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করেছেন, নিচে দেওয়া হলো:

১. সাক্ষ্যদাতা (شَاهِدًا - শাহিদ): রাসূলুল্লাহ (সা.) কিয়ামতের দিন তাঁর উম্মতের পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন যে, তিনি আল্লাহর বাণী তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এছাড়া পূর্ববর্তী নবীগণও যে তাঁদের উম্মতদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলেন, সে বিষয়েও তিনি সাক্ষ্য দেবেন।

২. সুসংবাদদাতা (مُبَشِّرًا - মুবাশশির): যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনবে এবং সৎ কাজ করবে, রাসূল (সা.) তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর দয়া, ক্ষমা এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের সুসংবাদ দানকারী।

৩. সতর্ককারী (نَذِيرًا - নাযীর): যারা আল্লাহর বিধান অমান্য করবে, কুফরি ও পাপকাজে লিপ্ত থাকবে, রাসূল (সা.) তাদেরকে আল্লাহর কঠিন শাস্তি ও জাহান্নামের আগুন সম্পর্কে সতর্ককারী।

৪. আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী (دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ - দা'ঈ ইলাল্লাহ): তিনি মানুষকে কোনো ব্যক্তি, দল বা মূর্তির দিকে নয়, বরং আল্লাহর নির্দেশে ও তাঁর অনুমতিক্রমে একমাত্র একাত্মবাদী দ্বীন বা আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বানকারী।

৫. উজ্জ্বল প্রদীপ (سِرَاجًا مُنِيرًا - সিরাজাম মুনিরা): প্রদীপ যেমন অন্ধকার দূর করে আলো ছড়ায়, তেমনি রাসূল (সা.) তাঁর আদর্শ, চরিত্র ও ওহীর জ্ঞান দিয়ে জাহেলিয়াত, কুসংস্কার ও শিরকের অন্ধকার দূর করে বিশ্ববাসীকে হেদায়েতের আলো দেখিয়েছেন।

৩৩ : ৪৭ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللهِ فَضْلًا كَبِيْرًا

৪৭. আর আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাঅনুগ্রহ।

এখানে "মহা অনুগ্রহ" বলতে দুনিয়া ও আখিরাতে মুমিনদের জন্য আল্লাহর বিশেষ রহমত, ক্ষমা এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের নেয়ামতকে বোঝানো হয়েছে।

মুমিনদের সুসংবাদ ও মহান প্রতিদানের বিষয়ে কুরআনের কয়েকটি আয়াত নিচে গ্রুপ করে দেওয়া হলো:

১. বিশ্বাস ও সৎকর্মের প্রতিদান হিসেবে জান্নাতের সুসংবাদ

সূরা আল-বাকারাহ (আয়াত ২৫): "আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত..

."সূরা আত-তাওবাহ (আয়াত ২১): "তাদের রব তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং এমন জান্নাতসমূহের, যেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী নেয়ামত।"

২. আল্লাহর ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের ঘোষণা

সূরা আল-হাজ্জ (আয়াত ৫০): "সুতরাং যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।

"সূরা আল-আহযাব (আয়াত ৩৫): "...আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।"

জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামতের সুসংবাদ:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা জান্নাতবাসীদের বলবেন, 'আমি কি তোমাদের ওপর আমার সন্তুষ্টি অবতীর্ণ করব না? এরপর আমি আর কখনোই তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হব না।'" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

সহজ আমলেই ক্ষমার সুসংবাদ:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন।" (সহীহ মুসলিম)

ধৈর্য ও বিশ্বাসের পুরস্কার:রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "মুমিনের বিষয় পার্টটি চমৎকার! তার সব কাজেই কল্যাণ রয়েছে। যদি তার কোনো কল্যাণ হয়, সে শোকরগোজার হয়, ফলে এটি তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি কোনো ক্ষতি হয়, সে ধৈর্য ধারণ করে, ফলে এটিও তার জন্য কল্যাণকর হয়।" (সহীহ মুসলিম)

৩৩ : ৪৮ وَ لَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ دَعْ اَذٰىهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا

৪৮. আর আপনি কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না, তাদের নির্যাতন উপেক্ষা করুন এবং নির্ভর করুন আল্লাহর উপর এবং কর্মবিধায়করূপে আল্লাহই যথেষ্ট।

আয়াতের মূল শিক্ষা ও নির্দেশনা:

কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য না করা:

অবিশ্বাসী ও কপট ব্যক্তিদের এমন কোনো কথা বা পরামর্শ শোনা যাবে না যা আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে যায়।

নির্যাতন উপেক্ষা করা: তাদের দেওয়া কষ্ট, যন্ত্রণাদায়ক আচরণ বা কটূক্তি গায়ে না মেখে ধৈর্য ধারণ করা এবং উপেক্ষা করা।

আল্লাহর ওপর ভরসা (তাওয়াক্কুল): সব কাজে একমাত্র আল্লাহর ওপর নির্ভর করা।আল্লাহই যথেষ্ট: সকল বিপদ-আপদ ও কাজের জন্য কার্যনির্বাহী বা অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট।

৩৩ : ৪৯ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَ سَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا

৪৯. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা মুমিন নারীদেরকে বিয়ে করবে, তারপর তাদেরকে স্পর্শ করার আগে তালাক দিবে, তখন তোমাদের জন্য তাদের পালনীয় কোন ইদ্দত নেই যা তোমরা

গুণবে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে কিছু সামগ্রী দেবে এবং সৌজন্যের সাথে তাদেরকে বিদায় করবে।

বিবাহের পর যে নারীর তার স্বামীর সাথে সঙ্গম হয়েছে ও সে যুবতী আছে, এই অবস্থায় সে তালাকপ্রাপ্তা হলে তার ইদ্দত তিন মাসিক। (সূরা বাক্বারাহ ২২৮ আয়াত) এখানে ঐ সকল নারীদের বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে যাদের বিয়ে হয়েছে কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গম হয়নি। এমতাবস্থায় যদি তালাক হয়ে যায়, তবে কোন ইদ্দত নেই। অর্থাৎ এই রকম সঙ্গমের পূর্বেই তালাকপ্রাপ্তা নারী কোন ইদ্দত পালন করা ছাড়াই যদি অন্য পুরুষকে বিবাহ করতে চায়, তাহলে সাথে সাথে বিবাহ করতে পারবে। তবে যদি সঙ্গমের পূর্বে স্বামীর মৃত্যু হয়, তবে তাকে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতেই হবে। (ফাতহুল ক্বাদীর, ইবনে কাসীর) 'স্পর্শ করা বা হাত লাগানো' বলে সঙ্গমের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। نكاح শব্দটি বিশেষ করে সঙ্গম এবং বিবাহ বন্ধন দুই অর্থেই ব্যবহার হয়। এখানে বিবাহ বন্ধনের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। উক্ত আয়াত থেকে দলীল নিয়ে বলা হয়েছে যে, বিবাহের পূর্বে তালাক হয় না। কারণ এখানে তালাকের বর্ণনা বিবাহের বর্ণনার পর এসেছে। সুতরাং যে সকল ফকীহগণ এই কথা বলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, 'যদি আমি অমুক নারীকে বিয়ে করি, তবে সে তালাক' তবে তাদের নিকট সেই নারীর সাথে বিয়ে হওয়া মাত্র তালাক হয়ে যাবে। অনুরূপ অনেকে বলেন যে, যদি সে বলে যে, 'আমি যে নারীকেই বিয়ে করব তাকে তালাক' তবে সে যে কোন নারীকেই বিয়ে করবে তালাক হয়ে যাবে। উক্ত মত দুটি সহীহ নয়। যেহেতু হাদীসে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে, ''বিবাহের পূর্বে তালাক নেই।'' (ইবনে মাজাহ) ''আদম সন্তান যার মালিক নয়, তার তালাক হয় না।'' (আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আহমাদ ২/১৮৯) এতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বিয়ের পূর্বে তালাক দেওয়া একটা ফালতু কাজ, শরীয়তে যার কোন স্থান নেই।

কুরআন ও সুন্নাতের ব্যাপারে বলা যায়, সেখানে 'নিকাহ' একটি পারিভাষিক শব্দ। সেখানে এর অর্থ হচ্ছে নিছক বিবাহ অথবা বিবাহোত্তর সঙ্গম। কিন্তু বিবাহ বিহীন সঙ্গম অর্থে একে কোথাও ব্যবহার করা হয়নি। এ ধরনের সঙ্গমকে তো কুরআন ও সুন্নাত বিয়ে নয়, যিনা ও ব্যভিচার বলে।

এই সামগ্রী হল, যদি মোহর ধার্য হয়ে থাকে, তবে তার অর্ধেক মোহর। আর ধার্য্য হয়ে না থাকলে সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু প্রদান করা হবে।

অর্থাৎ, কোন প্রকার কষ্ট না দিয়ে, ইজ্জত ও সম্মানের সাথে তাকে বিদায় করে দাও।

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِىٓ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّآ اَفَآءَ اللّٰهُ ৩৩ : ৫০
عَلَيْكَ وَ بَنٰتِ عَمِّكَ وَ بَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَ بَنٰتِ خَالِكَ وَ بَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِىْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ۫ وَ امْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ
وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِىُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا * خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ قَدْ عَلِمْنَا مَا
فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىٓ اَزْوَاجِهِمْ وَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

৫০. হে নবী! আমরা আপনার জন্য বৈধ করেছি আপনার স্ত্রীগণকে, যাদের মাহর আপনি দিয়েছেন এবং বৈধ করেছি ফায় হিসেবে আল্লাহ আপনাকে যা দান করেছেন তাদের মধ্য থেকে যারা আপনার মালিকানাধীন হয়েছে তাদেরকে। আর বিয়ের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচার কন্যা ও ফুফুর কন্যাকে, মামার কন্যা ও খালার কন্যাকে যারা আপনার সঙ্গে হিজরত করেছে এবং এমন মুমিন নারীকে (বৈধ করেছি) যে নবীর

জন্যে নিজেকে সমর্পণ করে, যদি নবী তাকে বিয়ে করতে চায়– এটা বিশেষ করে আপনার জন্য, অন্য মুমিনদের জন্য নয়; যাতে আপনার কোন অসুবিধা না হয়। আমরা অবশ্যই জানি মুমিনদের স্ত্রী এবং তাদের মালিকানাধীন দাসীগণ সম্বন্ধে তাদের উপর যা নির্ধারিত করেছি। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

শরীয়তে কিছু আহ্‌কাম নবী (সাঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট, যেগুলিকে নবী (সাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য বলা হয়। যেমন উলামাদের এক দলের মত অনুযায়ী তাহাজ্জুদের নামায তাঁর জন্য ফরয ছিল, সাদাকা তাঁর জন্য হারাম ছিল, অনুরূপ কিছু বিশেষত্বের বর্ণনা কুরআন কারীমের এই স্থানে করা হয়েছে, যা বিবাহ সম্পর্কিত।

হে নবী! আমি তোমার জন্য হালাল করে দিয়েছি তোমার স্ত্রীদেরকে যাদের মহর তুমি আদায় করে দিয়েছো-- যারা আপত্তি করে বলতো, "মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো অন্যদের জন্য একই সময় চারজনের বেশী স্ত্রী রাখতে নিষেধ করেন কিন্তু তিনি নিজে পঞ্চম স্ত্রী গ্রহণ করলেন কেমন করে," এখানে আসলে তাদের জবাব দেয়া হয়েছে। এ আপত্তির ভিত্তি ছিল এরই ওপর যে, হযরত যয়নবকে (রা.) বিয়ে করার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী ছিলেন চারজন।

এদের একজন ছিলেন হযরত সওদা (রা.)। তাঁকে তিনি বিয়ে করেছিলেন হিজরাতের ৩ বছর আগে।

দ্বিতীয় ছিলেন হযরত আয়েশা (রা.) তাঁকেও হিজরাতের ৩ বছর আগে বিয়ে করেছিলেন কিন্তু হিজরী প্রথম বছরের শওয়াল মাসে তিনি স্বামীগৃহে আসেন।

তৃতীয় স্ত্রী ছিলেন হযরত হাফসা (রা.) ৩ হিজরীর শাবান মাসে তাঁকে বিয়ে করেন।

চতুর্থ স্ত্রী ছিলেন হযরত উম্মে সালামাহ (রা.)। ৪ হিজরীর শওয়াল মাসে নবী করীম ﷺ তাঁকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন।

এভাবে হযরত যয়নব (রা.) ছিলেন তাঁর পঞ্চম স্ত্রী। এর বিরুদ্ধে কাফের ও মুনাফিকরা যে আপত্তি জানাচ্ছিল তার জবাব আল্লাহ এভাবে দিচ্ছেনঃ হে নবী! তোমার এ পাঁচজন স্ত্রী, যাদের মহর আদায় করে তুমি বিয়ে করেছো, তাদেরকে আমি তোমার জন্য হালাল করে দিয়েছি। অন্যকথায় এ জবাবের অর্থ হচ্ছে, সাধারণ মুসলমানদের জন্য চার-এর সীমা নির্দেশও আমিই করেছি এবং নিজের নবীকে এ সীমার উর্ধ্বেও রেখেছি আমিই। যদি তাদের জন্য সীমা নির্দেশ করার ইখতিয়ার আমার থেকে থাকে, তাহলে নবীকে সীমার ঊর্ধ্বে রাখার ইখতিয়ার আমার থাকবে না কেন?

এ জবাবের ব্যাপারে আবার একথা মনে রাখতে হবে যে, এর সাহায্যে কাফের ও মুনাফিকদেরকে নিশ্চিন্ত করা এর উদ্দেশ্য নয় বরং এমন মুসলমানদেরকে নিশ্চিন্ত করা এর উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম বিরোধীরা যাদের মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিল। তারা যেহেতু বিশ্বাস করতো, কুরআন আল্লাহর কালাম এবং আল্লাহর নিজের শব্দসহই এ কুরআন নাযিল হয়েছে, তাই কুরআনের একটি সুস্পষ্ট বক্তব্য সম্বলিত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ এ ঘোষণা দিয়েছেনঃ নবী নিজেই নিজেকে চারজন স্ত্রী রাখার সাধারণ আইনের আওতার বাইরে রাখেননি বরং এ ব্যবস্থা আমিই করেছি।

--- পঞ্চম স্ত্রীকে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য হালাল করা ছাড়াও আল্লাহ এ আয়াতে তাঁর জন্য আরো কয়েক ধরনের মহিলাদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছেনঃ

একঃ আল্লাহ প্রদত্ত বাঁদীদের মধ্য থেকে যারা তাঁর মালিকানাধীন হয়।

এ অনুমতি অনুযায়ী তিনি বনী কুরাইযার যুদ্ধবন্দিনীদের মধ্য থেকে হযরত রাইহানাকে (রা.),

বনিল মুসতালিকের যুদ্ধবন্দিনীদের মধ্য থেকে হযরত যুওয়াইরাকে (রা.),

খয়বরের যুদ্ধবন্দিনীদের মধ্য থেকে হযরত সফীয়াকে (রা.) এবং

মিসরের মুকাওকিস প্রেরিত হযরত মারিয়া কিবতিয়াকে (রা.) নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নেন।

এদের মধ্য থেকে প্রথমোক্ত তিনজনকে তিনি মুক্তি দান করে তাদেরকে বিয়ে করেন। কিন্তু হযরত মারিয়া কিবতিয়ার (রা.) সাথে মালিকানাধীন হবার ভিত্তিতে সহবাস করেন। তিনি তাকে মুক্তি দিয়ে বিয়ে করেন একথা তার সম্পর্কে প্রমাণিত নয়।

দুইঃ তাঁর চাচাত, মামাত, ফুফাত ও খালাত বোনদের মধ্য থেকে যারা হিজরাতে তাঁর সহযোগী হন। আয়াতে তাঁর সাথে হিজরত করার যে কথা এসেছে তার অর্থ এ নয় যে, হিজরাতের সফরে তাঁর সাথেই থাকতে হবে বরং এর অর্থ ছিল, ইসলামের জন্য তাঁরাও আল্লাহর পথে হিজরত করেন। তাঁর ওপরে উল্লেখিত মুহাজির আত্মীয়দের মধ্য থেকেও যাকে ইচ্ছা তাকে বিয়ে করার ইখতিয়ারও তাঁকে দেয়া হয়। কাজেই এ অনুমতির ভিত্তিতে তিনি ৭ হিজরী সালে হযরত উম্মে হাবীবাকে (রা.) বিয়ে করেন। (পরোক্ষভাবে এ আয়াতে একথা সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, চাচা, মামা, ফুফী ও খালার মেয়েকে বিয়ে করা একজন মুসলমানের জন্য হালাল। এ ব্যাপারে ইসলামী শরীয়াত খৃস্ট ও ইহুদী উভয় ধর্ম থেকে আলাদা। খৃস্টীয় বিধানে এমন মহিলাকে বিয়ে করা অবৈধ যার সাথে সাত পুরুষ পর্যন্ত পুরুষের বংশধারা মিলে যায়। আর ইহুদীদের সমাজে সহোদর ভাইঝি ও ভাগনীকেও বিয়ে করা বৈধ।)

তিনঃ যে মু’ মিন নারী নিজেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ‘হিবা’ তথা দান করে অর্থাৎ মহর ছাড়াই নিজেকে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে তৈরি হয়ে যায় এবং নবী (সা.) তা গ্রহণ করা পছন্দ করেন। এ অনুমতির ভিত্তিতে তিনি ৭ হিজরীর শওয়াল মাসে হযরত মায়মুনাকে (রা.) নিজের সহধর্মিনী রূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু মহর ছাড়া তার হিবার সুযোগ নেয়া পছন্দ করেননি। তাই তার কোন আকাঙ্ক্ষা ও দাবী ছাড়াই তাঁকে মহর দান করেন। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন হিবাকারিনী স্ত্রী ছিল না। কিন্তু এর অর্থ আসলে হচ্ছে এই যে, তিনি হিবাকারিনী কোন স্ত্রীকেও মহর থেকে বঞ্চিত করেননি।

বিবাহ বন্ধনের যে শর্ত ও অধিকারসমূহ যা আমি ফরয করেছি; যেমনঃ কেউ একই সঙ্গে চারের অধিক স্ত্রী বিবাহ বন্ধনে রাখতে পারে না, (মহিলার জন্য) অলী বা অভিভাবকের সম্মতি, সাক্ষী ও মোহর আবশ্যিক। তবে ক্রীতদাসী হলে যতজন ইচ্ছা রাখতে পারা যায়। কিন্তু বর্তমানে ক্রীতদাসীর (দাসত্ব) প্রথাই তো নেই।

এটা ‘إِنَّا أَحْلَلْنَا’ এর সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ উপরি উল্লিখিত সকল মহিলা নবী (সাঃ)-এর জন্য এই কারণে বৈধ, যাতে নবী (সাঃ) অসুবিধা মনে না করেন এবং তিনি তাদের মধ্যে কাউকে বিবাহ করাতে মনে পাপবোধ না করেন।

**** সাধারণ নিয়ম থেকে মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে আলাদা রেখেছেন তার মধ্যে রয়েছে এ সুবিধা ও কল্যাণ। “যাতে সংকীর্ণতা ও অসুবিধা না থাকে” -এর অর্থ এ নয় যে, নাউযুবিল্লাহ তাঁর প্রবৃত্তির লালসা খুব বেশী বেড়ে গিয়েছিল বলে তাঁকে বহু স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয়া হয়, যাতে শুধুমাত্র চারজন স্ত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে তিনি সংকীর্ণতা ও অসুবিধা অনুভব না করেন। এ বাক্যাংশের এ অর্থ কেবলমাত্র এমন এক ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারে যে বিদ্বেষ ও সংকীর্ণ স্বার্থপ্রীতিতে অন্ধ হয়ে একথা ভুলে যায় যে, মুহাম্মাদ ﷺ ২৫ বছর বয়সে এমন এক মহিলাকে বিয়ে করেন যার বয়স ছিল তখন ৪০ বছর এবং পুরো ২৫ বছর ধরে তিনি তাঁর সাথে অত্যন্ত সুখী দাম্পত্য জীবন যাপন করতে থাকেন। তাঁর ইন্তিকালের পর তিনি অন্য একজন অধিক বয়সের বিগত যৌবনা মহিলা হযরত সওদাকে (রা.) বিয়ে করেন। পুরো চার বছর পর্যন্ত তিনি একাই ছিলের তাঁর স্ত্রী। এখন কোন বুদ্ধিমান বিবেকবান ব্যক্তি একথা কল্পনা করতে পারে যে, ৫৩ বছর পার হয়ে যাবার পর সহসা তাঁর যৌন কামনা বেড়ে যেতে থাকে এবং তাঁর অনেক বেশী সংখ্যক স্ত্রীর প্রয়োজন হয়ে পড়ে? আসলে “সংকীর্ণতা ও অসুবিধা না থাকে” -এর অর্থ অনুধাবন করতে হলে একদিকে নবী করীমের ﷺ ওপর আল্লাহ যে মহান দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন তার প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং অন্যদিকে যে অবস্থার মধ্যে আল্লাহ তাঁকে এ মহান দায়িত্ব সম্পাদন করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন তা অনুধাবন করা জরুরী। সংকীর্ণ স্বার্থপ্রীতি থেকে মন-মানসিতকাকে মুক্ত করে যে ব্যক্তিই এ দু’ টি সত্য অনুধাবন করবেন তিনিই স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারে তাঁকে ব্যাপক অনুমতি দেয়া কেন জরুরী ছিল এবং চারের সীমারেখা নির্দেশের মধ্যে তাঁর জন্য কি সংকীর্ণতা ও অসুবিধা ছিল তা ভালোভাবেই জানতে পারবেন।

নবী করীমকে ﷺ যে কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তা ছিল এই যে, তিনি একটি অসংগঠিত ও অপরিপক্ক জাতিকে, যারা কেবল ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকেই নয় বরং সাধারণ সভ্যতা সংস্কৃতির দৃষ্টিতেও ছিল অগোছালো ও অগঠিত, তাদেরকে জীবনের প্রতিটি বিভাগে শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে একটি উন্নত পর্যায়ের সুসভ্য, সংস্কৃতিবান ও পরিচ্ছন্ন জাতিতে পরিণত করবেন। এ উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র পুরুষদেরকে অনুশীলন দেয়া যথেষ্ট ছিল না বরং মহিলাদের অনুশীলনও সমান জরুরী ছিল। কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে মূলনীতি শিখাবার জন্য তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন তার দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ ছিল এবং এ নিয়ম ভংগ করা ছাড়া তাঁর পক্ষে মহিলাদেরকে সরাসরি অনুশীলন দান করা সম্ভবপর ছিল না। তাই মহিলাদের মধ্যে কাজ করার কেবলমাত্র একটি পথই তাঁর জন্য খোলা ছিল এবং সেটি হচ্ছে, বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন বৃদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা সম্পন্ন মহিলাদেরকে তিনি বিয়ে করতেন, নিজে সরাসরি তাদেরকে অনুশীলন দান করে তার নিজের সাহায্য সহায়তার জন্য প্রস্তুত করতেন এবং তারপর তাদের সাহায্যে নগরবাসী ও মরুচারী এবং যুবতী, পৌঢ় ও বৃদ্ধা সব ধরনের নারীদেরকে দ্বীন, নৈতিকতা ও কৃষ্টি সংস্কৃতির নতুন নীতিসমূহ শিখাবার ব্যবস্থা করতেন।

এছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পুরাতন জাহেলী জীবন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে তার জায়গায় কার্যত ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্বও দেয়া হয়েছিল। এ দায়িত্ব সম্পাদন করার জন্য জাহেলী জীবন ব্যবস্থার প্রবক্তা ও পতাকাবাহীদের সাথে যুদ্ধ অপরিহার্য ছিল। এ সংঘাত এমন একটি দেশে শুরু হতে যাচ্ছিল যেখানে গোত্রীয় জীবনধারা নিজের বিশেষ বিশেষ সাংস্কৃতিক অবয়বে প্রচলিত ছিল। এ অবস্থায় অন্যান্য ব্যবস্থার সাথে বিভিন্ন পরিবারে বিয়ে করে বহুবিধ বন্ধুত্বকে পাকাপোক্ত এবং বহুতর শত্রুতাকে খতম করার ব্যবস্থা

করা তাঁর জন্য জরুরী ছিল। তাই যেসব মহিলাকে তিনি বিয়ে করেন তাঁদের ব্যক্তিগত গুণাবলী ছাড়াও তাঁদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে এসব বিষয়ও কমবেশী জড়িত ছিল।

- হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত হাফসাকে (রা.) বিয়ে করে তিনি হযরত আবুবকর (রা.) ও হযরত উমরের (রা.) সাথে নিজের সম্পর্ককে আরো বেশী গভীর ও মজবুত করে নেন।
- হযরত উম্মে সালামাহ (রা.) ছিলেন এমন এক পরিবারের মেয়ে যার সাথে ছিল আবু জেহেল ও খালেদ ইবনে ওলিদের সম্পর্ক।
- হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) ছিলেন আবু সুফিয়ানের মেয়ে। এ বিয়েগুলো সংশ্লিষ্ট পরিবার গুলোর শত্রুতার জের অনেকাংশে কমিয়ে দেয়। বরং হযরত উম্মে হাবীবার সাথে নবী করীমের ﷺ বিয়ে হবার পর আবু সুফিয়ান আর কখনো তাঁর মোকাবিলায় অস্ত্র ধরেননি।
- হযরত সুফিয়া (রা.), হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) ও হযরত রাইহানা (রা.) ইহুদি পরিবারের মেয়ে ছিলেন। তাঁদেরকে মুক্ত করে দিয়ে যখন নবী করীম (রা.) তাঁদেরকে বিয়ে করেন তখন তাঁর বিরুদ্ধে ইহুদিদের তৎপরতা স্তিমিত হয়ে পড়ে। কারণ সে যুগের আরবীয় নীতি অনুযায়ী যে ব্যক্তির সাথে কোন গোত্রের মেয়ের বিয়ে হতো তাকে কেবল মেয়েটির পরিবারেরই নয় বরং সমগ্র গোত্রের জামাতা মনে করা হতো এবং জামাতার সাথে যুদ্ধ করা ছিল বড়ই লজ্জাকর।

সমাজের কার্যকর সংশোধন এবং তার জাহেলী রসম রেওয়াজ নির্মূল করাও তাঁর নবুওয়াতের অন্যতম দায়িত্ব ছিল। কাজেই এ উদ্দেশ্যেও তাঁকে একটি বিয়ে করতে হয়। সূরা আহযাবে এ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে।

এসব বিষয় বিয়ের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য কোন রকম সংকীর্ণতা ও অসুবিধা না রাখার তাগাদা করছিল। এর ফলে যে মহান দায়িত্ব তাঁর প্রতি অর্পিত হয়েছিল তার প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তিনি প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিয়ে করতে পারতেন।

যারা মনে করেন একাধিক বিয়ে কেবলমাত্র কয়েকটি বিশেষ ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই বৈধ এবং সেগুলো ছাড়া তা বৈধ হবার পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না, এ বর্ণনা থেকে তাদের চিন্তার বিভ্রান্তিও সুস্পষ্ট হয়ে যায়। একথা সুস্পষ্ট যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একাধিক বিয়ে করার পেছনে তা স্ত্রীর রুগ্নতা, বন্ধ্যাত্ব বা সন্তানহীনতা অথবা এতিম প্রতিপালনের সমস্যা ছিল না। এসব সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছাড়া তিনি সমস্ত বিয়ে করেন প্রচার ও শিক্ষামূলক প্রয়োজনে অথবা সমাজ সংস্কারার্থে কিংবা রাজনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্যে। প্রশ্ন হচ্ছে, যখন আজ হাতেগোনা যে কয়টি বিশেষ উদ্দেশ্যের কথা বলা হচ্ছে আল্লাহ নিজেই সেগুলোর জন্য একাধিক বিয়েকে সীমাবদ্ধ করে রাখেননি এবং আল্লাহর রসূল এগুলো ছাড়া অন্যান্য বহু উদ্দেশ্যে একাধিক বিয়ে করেছেন তখন অন্য ব্যক্তি আইনের মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে কতিপয় শর্ত ও বিধি-নিষেধ আরোপ করার এবং সে শরীয়াত অনুযায়ী এ নির্ধারণ করছে বলে দাবী করার কী অধিকার রাখে? আসলে একাধিক বিয়ে মূলতই একটি অপকর্ম, এই পাশ্চত্য ধারণাটি উক্ত সীমা নির্ধারণের মূলে কাজ করছে। উক্ত ধারণার ভিত্তিতে এ মতবাদেরও জন্ম হয়েছে যে, এ হারাম কাজটি যদি কখনো হালাল হয়েও যায় তাহলে তা কেবলমাত্র অপরিহার্য প্রয়োজনের জন্যই হতে পারে। এখন এ বাইর থেকে আমদানী করা চিন্তার ওপর ইসলামের জাল ছাপ লাগাবার

যতই চেষ্টা করা হোক না কেন কুরআন ও সুন্নাহ এবং সমগ্র উম্মাতে মুসলিমার সাহিত্য এর সাথে মোটেই পরিচিত নয়।

تُرْجِىْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَ تُـْٔوِىْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ۗ وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَ لَا يَحْزَنَّ وَ يَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ৩৩ : ৫১

৫১. আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে আপনার কাছ থেকে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছে আপনার কাছে স্থান দিতে পারেন। আর আপনি যাকে দূরে রেখেছেন তাকে কামনা করলে আপনার কোন অপরাধ নেই।এ বিধান এ জন্যে যে, এটা তাদের চোখ জুড়ানোর অধিক নিকটবর্তী এবং তারা দুঃখ পাবে না। আর তাদেরকে আপনি যা দেবেন তাতে তাদের প্রত্যেকেই খুশী থাকবে। আর তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ তা জানেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

---আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে আপনার কাছ থেকে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছে আপনার কাছে স্থান দিতে পারেন।

এখানে নবী (সাঃ)-এর আরো একটি বিশেষত্বের কথা বর্ণনা হয়েছে, আর তা হল এই যে, স্ত্রীদের মাঝে পালা নির্ধারণ করাতে তাঁকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। তিনি যার পালা চাইবেন বন্ধ রাখতে পারবেন, অর্থাৎ তাকে বিবাহ বন্ধনে রেখে তার সাথে রাত্রিযাপন না করে অন্য যে কোন স্ত্রীর সাথে চাইবেন রাত্রিযাপন করতে পারবেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, যে সমস্ত নারীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজেদেরকে দান করত এবং বিয়ে করত, আমি তাদের প্রতি ঈর্ষাণ্বিত হতাম। আমি বলতাম, একজন মহিলা কি করে নিজেকে দান করতে পারে? কিন্তু যখন এ আয়াত নাযিল হল, তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, আমি দেখছি আপনার রব আপনার ইচ্ছা অনুসারেই তা করেছেন। [বুখারী: ৫১১৩; মুসলিম: ১৪৬৪]

---- এবং তুমি যাকে দূরে রেখেছ, তাকে কামনা করলে তোমার কোন অপরাধ নেই।

অর্থাৎ, যে সকল স্ত্রীদের পালা বন্ধ রেখেছিলেন, যদি তিনি তাদের সাথে সঙ্গমের সম্পর্ক রাখতে চান, তবে পুনরায় এ সম্পর্ক কায়েম করতে পারেন -- তার অনুমতি আছে।

---- এ বিধান এ কথার অধিক নিকটতর যে, ওদের চক্ষু শীতল হবে এবং ওরা দুঃখ পাবে না এবং তুমি যা দেবে তাতে ওদের সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে।

অর্থাৎ, নবী (সাঃ) পালা বন্ধ করলে এবং একজনকে অপর জনের উপর প্রাধান্য দিলেও স্ত্রীরা সন্তুষ্ট থাকবেন; দুঃখিত হবেন না। তাঁরা তাঁর নিকট থেকে যা পাবেন তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন। কারণ তাঁরা জানেন যে, নবী (সাঃ) যা কিছু করছেন আল্লাহ তাআলার আদেশেই করছেন সুতরাং সকল স্ত্রীগণ আল্লাহর ফায়সালার উপর সর্বদা সন্তুষ্ট ও খুশি থাকবেন। কেউ কেউ বলেন যে, নবী (সাঃ) এই এখতিয়ার পাওয়ার পরেও তিনি তা ব্যবহার করেননি এবং সওদা (রাঃ) ছাড়া (যেহেতু তিনি আপন পালা নিজেই আয়েশাকে দান করে

দিয়েছিলেন) তিনি সকল স্ত্রীদের পালা সমানভাবে নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। যার ফলে তিনি মৃত্যু শয্যায় অন্যান্য স্ত্রীগণ থেকে অনুমতি নিয়ে অসুস্থাবস্থার (পবিত্র জীবনের শেষ) দিনগুলি আয়েশা (রাঃ) -এর নিকট অতিবাহিত করেছিলেন। 'أَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ' (ওদের চক্ষু শীতল হবে) এ কথা নবী (সাঃ)-এর উক্ত আমলের সাথে সম্পৃক্ত যে, নবী (সাঃ)-এর জন্য পালা ভাগ করা যদিও অন্যান্য মানুষের মত আবশ্যিক ছিল না, তবুও তিনি পালা ভাগ করাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যাতে নবী (সাঃ)-এর স্ত্রীগণের চক্ষু শীতল থাকে এবং তাঁর সদ্ব্যবহারে এবং সমতা ও ইনসাফে সন্তুষ্ট হয়ে যান। এই কারণে তিনি নিজের বিশেষত্বকে ব্যবহার না করে তাঁদের মন জয় করাকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

--- তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা জানেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল ।

অর্থাৎ, তোমাদের হৃদয়ে যে গুপ্ত প্রেম আছে তা আল্লাহ জানেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মনে সকল স্ত্রীর মহববত এক রকম হয় না। কারণ মন মানুষের ইচ্ছার উপর থাকে না। যার ফলে স্ত্রীদের মাঝে পালা, খরচ-খরচা ও জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুতে সমতা বজায় রাখা আবশ্যিক, যাতে মানুষ ইনসাফ করতে সচেষ্ট হতে পারে। কিন্তু হৃদয়স্থ ভালোবাসার সমতা বজায় রাখা যেহেতু মানুষের ইচ্ছা ও সাধ্যের বাইরে, তাই আল্লাহ তাআলা তা ধরবেন না। তবে আন্তরিক ভালবাসা যেন কোন একজন স্ত্রীর সাথে বিশেষ ভাল ব্যবহারের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণে তিনি ইনসাফের সাথে পালা নির্ধারণ করে বলতেন, ''হে আল্লাহ! আমি পালা ভাগ করার মালিক, পালা ভাগ করলাম। কিন্তু আমি যার মালিক নই; বরং তুমি যার মালিক তার ব্যাপারে তুমি আমাকে দোষ দিয়ো না।' ' (আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ আহমাদ ৬/১৪৪) (অর্থাৎ হৃদয় ও তার প্রেম ভাগ করার ক্ষমতা আমার নেই। হৃদয়ের মালিক তো তুমি। কারো প্রতি হৃদয়ের আকর্ষণ বেশী থাকলে তার জন্য আমি দায়ী নই।)

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنۢ بَعْدُ وَ لَاۤ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ৫২ : ৩৩
اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا

(৫২) এরপর তোমার জন্য কোন নারী বৈধ নয় এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয়; যদিও ওদের রূপ-সৌন্দর্য তোমাকে মোহিত করে। তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এ বিধান প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ সমস্ত কিছুর উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন।

ইবন আব্বাস, মুজাহিদ, দাহহাক, কাতাদাহ সহ অনেক আলেমের নিকট এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের পুরস্কারস্বরূপ নাযিল হয়েছিল।

এখতিয়ারের আয়াত নাযিল হওয়ার পর নবী পত্নীগণ দুনিয়ার আয়েশ-আরামের সামগ্রীর পরিবর্তে সানন্দ চিত্তে নবী (সাঃ)-এর সাথে বসবাস করাকে পছন্দ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তার বদলা এই দিলেন যে, নবী (সাঃ)-কে সেই স্ত্রীগণ ছাড়া (সে সময় তাঁরা নয় জন ছিলেন) অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করা বা তাঁদের কাউকে তালাক দিয়ে তাঁর পরিবর্তে অন্য কাউকে বিবাহ করতে নিষেধ করে দিলেন। অনেকে বলেন, পরে নবী (সাঃ)-কে তার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি আর কোন বিবাহ করেননি। (ইবনে কাসীর)

অর্থাৎ, ক্রীতদাসী রাখার ব্যাপারে কোন বাধা নেই। অনেকে আয়াতের ব্যাপক নির্দেশ থেকে দলীল নিয়ে বলেন যে, নবী (সাঃ)-কে কাফের ক্রীতদাসী রাখারও অনুমতি দেওয়া ছিল। আবার অনেকে (وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) ''তোমরা অবিশ্বাসী নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না' ' (মুমতাহিনা ১০) আয়াতের ভিত্তিতে বলেন, নবী (সাঃ)-এর জন্য কাফের ক্রীতদাসী হালাল ছিল না। (ফাতহুল ক্বাদীর)

--তবে বাঁদীদের মধ্য থেকে তোমার অনুমতি আছে।

এ আয়াতটি পরিষ্কার করে একথা বর্ণনা করছে যে, বিবাহিতা স্ত্রীগণ ছাড়া মালিকানাধীন নারীদের সাথেও মিলনের অনুমতি রয়েছে এবং তাদের ব্যাপারে কোন সংখ্যা-সীমা নেই। সূরা নিসার ৩ আয়াতে, সূরা মু' মিনূনের ৬ আয়াতে এবং সূরা মা' আরিজের ৩০ আয়াতে এ বিষয়বস্তুটি পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে। এ সমস্ত আয়াতে মালিকানাধীন মহিলাদেরকে বিবাহিতা নারীদের মোকাবিলায় একটি আলাদা গোষ্ঠী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তারপর তাদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনকে বৈধ গণ্য করা হয়েছে। এছাড়াও সূরা নিসার ৩ আয়াত বিবাহিতা স্ত্রীদের জন্য ৪ জনের সীমারেখা নির্ধারণ করে। কিন্তু সেখানে আল্লাহ্ মালিকানাধীন মহিলাদের কোন সংখ্যাসীমা বেঁধে দেননি এবং এতদসংক্রান্ত অন্য আয়াতগুলোতেও কোথাও এ ধরনের কোন সীমার প্রতি ইঙ্গিতও করেননি। বরং এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, আপনার জন্য এরপর অন্য মহিলাদেরকে বিয়ে করা অথবা কাউকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রী নিয়ে আসা হালাল নয়। তবে মালিকানাধীন মহিলারা হালাল। এ থেকে পরিষ্কার প্রকাশ হয় মালিকানাধীন মহিলাদের ব্যাপারে কোন সংখ্যা-সীমা নির্ধারিত নেই।

কিন্তু এর অর্থ এ নয়, ইসলামী শরীয়াত ধনীদের অসংখ্য বাঁদী কিনে আয়েশ করার জন্য এ সুযোগ দিয়েছে। বরং আসলে প্রবৃত্তি পূজারী লোকেরা এ আইনটি থেকে অযথা সুযোগ গ্রহণ করেছে। আইন তৈরি করা হয়েছিল মানুষের সুবিধার জন্য। আইন থেকে এ ধরনের সুযোগ গ্রহণের জন্যও তা তৈরি করা হয়নি। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঠিক তেমনি যেমন শরীয়াত একজন পুরুষকে চারজন পর্যন্ত মহিলাকে বিয়ে করার অনুমতি দেয় এবং তাকে নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করারও অনুমতি দেয়। মানুষের প্রয়োজন সামনে রেখে এ আইন তৈরি করা হয়েছিল। এখন যদি কোন ব্যক্তি নিছক আয়েশ করার জন্য চারটি মহিলাকে বিয়ে করে কিছুদিন তাদের সাথে থাকার পর তাদেরকে তালাক দিয়ে আবার নতুন করে চারটি বউ ঘরে আনার ধারা চালু করে, তাহলে এটা তো আইনের অবকাশের সুযোগ গ্রহণ করাই হয়। এর পুরো দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপরই বর্তাবে, আল্লাহর শরীয়াতের ওপর নয়। অনুরূপভাবে যুদ্ধে গ্রেফতারকৃত মহিলাদেরকে যখন তাদের জাতি মুসলিম বন্দীদের বিনিময়ে ফিরিয়ে নিতে অথবা মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে এগিয়ে আসে না তখন ইসলামী শরীয়াত তাদেরকে বাঁদী হিসেবে গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছে। তাদেরকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যেসব ব্যক্তির মালিকানায় দিয়ে দেয়া হয় তাদের ঐ সব মহিলার সাথে সঙ্গম করার অধিকার দিয়েছে। এর ফলে তাদের অস্তিত্ব সমাজে নৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায় না। তারপর যেহেতু বিভিন্ন যুদ্ধে গ্রেফতার হয়ে আসা লোকদের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা থাকতে পারে না, তাই আইনগতভাবে এক ব্যক্তি একই সঙ্গে ক' জন গোলাম বা বাঁদী রাখতে পারে, এরও কোন সীমা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। গোলাম ও বাঁদীদের বেচাকেনাও এজন্য বৈধ রাখা হয়েছে যে, যদি কোন গোলাম বা বাঁদীর তার মালিকের সাথে বনিবনা না হয় তাহলে সে অন্য মালিকের অধীনে চলে যেতে পারবে এবং এক ব্যক্তির চিরন্তন মালিকানা মালিক ও অধীনস্থ উভয়ের জন্য

আযাবে পরিণত হবে না। শরীয়াত এ সমস্ত নিয়ম ও বিধান তৈরি করেছিল মানুষের অবস্থা ও প্রয়োজন সামনে রেখে তার সুবিধার জন্য। যদি ধনী লোকেরা একে বিলাসিতার মাধ্যমে পরিণত করে নিয়ে থাকে তাহলে এজন্য শরীয়াত নয়, তারাই অভিযুক্ত হবে।

<u>রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীরা হলেন:</u>

১- খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ, ২- সাওদা বিনতে যাম' আ, ৩- আয়েশা বিনতে আবু বকর আস-সিদ্দীক, ৪- হাফসা বিনতে উমর, ৫- যাইনাব বিনতে খুযাইমা, ৬- উম্মে সালমা বিনতে আবু উমাইয়া, ৭- জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারেস, ৮- যাইনাব বিনতে জাহশ, ৯- উম্মে হাবীবাহ বিনতে আবু সুফিয়ান ১০- মাইমূনা বিনতুল হারেস, ১১- সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই ইবনে আখত্বাব।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের প্রতি। পর সমাচার:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমস্ত নারীদেরকে বিয়ে করেছেন তারা হলেন:

১. খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু আনহা

তিনি হলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম স্ত্রী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পঁচিশ বছর বয়সে তাকে বিয়ে করেন। তিনি মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত অন্য কাউকে নবীজী বিয়ে করেননি। নবীজীর সকল সন্তান খাদীজার ঘর থেকে; ইব্রাহীম ছাড়া।

বুখারী রাহিমাহুল্লাহ সহিহ গ্রন্থে একটি পরিচ্ছেদের নাম দিয়েছেন: 'খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ ও তাঁর মর্যাদা' । উক্ত পরিচ্ছেদে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন: তিনি বলেন: "আমি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী খাদীজার প্রতি যে ঈর্ষা করেছি অন্য কোন স্ত্রীর প্রতি তেমন ঈর্ষা করিনি। কেননা আমি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর কথা বারবার আলোচনা করতে শুনেছি। অথচ আমাকে বিবাহ করার আগেই তিনি ইন্তিকাল করেছিলেন।" [হাদীসটি বুখারী (৩৮১৫) বর্ণনা করেন]

২. সাওদা বিনতে যাম' আ ইবনে কাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তের দশম বছরে তাকে বিবাহ করেন।[ইবনে সাদের 'ত্বাবাকাত' (৮/৫২-৫৩) ও ইবনে কাসীরের 'আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ' (৩/১৪৯)]

৩. আয়েশা বিনতে আবু বকর আস-সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুমা

নবুয়তের দশম বছর শাওয়াল মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।[ইবনে সাদ (৮/৫৮-৫৯)] তিনি বলেন: 'আমার বয়স যখন ছয় বছর তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিয়ে করেন। আমার বয়স যখন নয় বছর তখন আমাকে নিয়ে ঘর করেন।' [হাদীসটি বুখারী (৩৮৯৪) ও মুসলিম (১৪২২) বর্ণনা করেন] বুখারী (৫০৭৭) আরো বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ছাড়া অন্য কোনো কুমারী নারীকে বিয়ে করেননি।

৪. হাফসা বিনতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন: উমর ইব্‌নুল খাত্তাবের মেয়ে হাফসার স্বামী খুনাইস ইবনে হুযাইফাহ সাহমী রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তিনি মদিনায় ইন্তিকাল করলে হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা বিধবা হয়ে পড়লেন। উমর বলেন: তখন আমি উসমান ইবনে আফফানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁর কাছে হাফসার কথা উল্লেখ করে তাঁকে বললাম: 'আপনি ইচ্ছা করলে আমি আপনার সঙ্গে হাফসা বিনতে উমরের বিয়ে দিয়ে দেব।' উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: 'ব্যাপারটি আমি একটু চিন্তা করে দেখি।' উমর বলেন: আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করলাম। পরে উসমান বললেন: 'আমার মতামত হচ্ছে এখন আমি বিয়ে করব না।' উমর বলেন: এরপর আমি আবূ বকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে বললাম: আপনি ইচ্ছা করলে হাফসা বিনতে উমর-কে আমি আপনার নিকট বিয়ে দেব। আবু বকর চুপ করে রইলেন, কোন জবাব দিলেন না। এতে আমি উসমানের চেয়েও বেশি দুঃখ পেলাম। এরপর আমি কয়েকদিন চুপ করে থাকলাম, ইতোমধ্যে হাফসার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই প্রস্তাব দিলেন এবং আমি তাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিয়ে দিলাম। এরপর আবু বকর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন: 'আমার সঙ্গে হাফসার বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার পর আমি আপনাকে কোন উত্তর না দেয়ার কারণে সম্ভবত আপনি মনঃকষ্ট পেয়েছেন।' আমি বললাম: হ্যাঁ। তখন আবূ বকর বললেন: ''আপনার প্রস্তাবে সাড়া দিতে একটি জিনিসই আমাকে বাধা দিয়েছিল। আর তা হলো: আমি জেনেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই হাফসার ব্যাপারে আলোচনা করছেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোপনীয় বিষয়টি প্রকাশ করার আমার ইচ্ছা ছিল না। যদি তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাফসাকে বিয়ে না করতেন তাহলে অবশ্যই আমি তাকে বিয়ে করতাম।" [হাদীসটি বুখারী (৪০০৫) বর্ণনা করেন]

৫. যাইনাব বিনতে খুযাইমা রাদিয়াল্লাহু আনহা

হিজরতের একত্রিশ মাসের মাথায় রমযান মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিয়ে করেন।[ত্বাবাকাত ইবনে সাদ (৮/১১৫)]

৬. উম্মে সালামাহ বিনত আবু উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা

মুসলিম (৯১৮) বর্ণনা করেন: উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: যখন কোন মুসলিম (কোনো ছোট-বড়) বিপদে পড়ে এবং আল্লাহ তা' আলার নির্দেশ অনুসারে এ কথাগুলো বলে:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

অর্থাৎ ''আমরা আল্লাহর মালিকানাধীন এবং তাঁরই কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন। হে আল্লাহ! আমার বিপদের জন্য আমাকে নেকী দিন। আর (এ বিপদে) যা হারিয়েছি আমাকে এর জন্য উত্তম প্রতিস্থাপন দান করুন।" আল্লাহ তাকে তার এ বিপদে সওয়াব দান করেন এবং এর উত্তম প্রতিস্থাপন দান করেন। উম্মে সালামা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: 'যখন আবূ সালামা মারা গেলেন তখন আমি সে দোয়াটি বললাম যেভাবে বলার

জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন। তখন আল্লাহ আমাকে আবু সালামার চেয়ে উত্তম প্রতিস্থাপন হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (স্বামীরূপে) প্রদান করলেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে: যখন আবু সালামা মারা গেলেন তখন আমি বললাম: ‘আবু সালামা থেকে উত্তম কে থাকতে পারে; যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী? পরবর্তীতে আল্লাহ আমার অন্তরে প্রত্যয় সৃষ্টি করে দিলেন, তখন আমি দোয়াটা পড়লাম। উম্মে সালাম বলেন: এরপর আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিয়ে করলাম।’

৭- জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহা

বনুল মুস্তালিক যুদ্ধে তিনি মুসলিমদের হাতে বন্দি হন। তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে 'মুকাতাবা' পদ্ধতিতে দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য অর্থ পরিশোধে সাহায্য চান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মুকাতাবার অর্থ পরিশোধ ও তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। এতে জুওয়াইরিয়া রাজী হয়ে যান। এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিয়ে করেন এবং মুক্তিপণ পরিশোধই ছিল তার বিয়ের মোহরানা। লোকেরা যখন এটা জানতে পারল তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্বশুরালয়ের সম্মানে তাদের হাতে থাকা বন্দিদেরকে মুক্ত করে দিল। ফলে তার গোত্রের জন্য তার মত বরকতময় এমন আর কোনো নারী ছিল না।[ইবনে ইসহাক হাসান সনদে এটি বর্ণনা করেন। সীরাতে ইবনে হিশাম (৩/৪০৮-৪০৯)]

৮- যাইনাব বিনতে জাহশ রাদিয়াল্লাহু আনহা

তার ব্যাপারে আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হয়:

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا

“অতঃপর যায়েদ যখন তার সাথে (স্ত্রী যাইনাবের সাথে) সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করালাম; যাতে (ভবিষ্যতে) পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে তাদের ব্যাপারে (তাদের বিয়ে করতে) মুমিনদের কোনো বাধা না থাকে।” [সূরা আহযাব: ৩৭]

তিনি এটি নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য স্ত্রীদের উপর গর্ব করে বলতেন: “তোমাদেরকে তোমাদের পরিবারেরা বিয়ে দিয়েছে। আর আমাকে আল্লাহ তাআলা সাত আসমানের উপর থেকে বিয়ে দিয়েছেন।” [হাদীসটি বুখারী (৭৪২০) বর্ণনা করেছেন]

৯. উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুমা

আবু দাউদ (২১০৭) বর্ণনা করেন: উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহশের স্ত্রী। হাবশায় উবাইদুল্লাহ মারা যান। নাজ্জাশী তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাকে বিবাহ দেন। নবীজীর পক্ষ থেকে তিনি উম্মে হাবীবাকে চার হাজার দিরহাম মোহরানা প্রদান করেন এবং শুরাহবিল ইবনে হাসানাহর সাথে তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠিয়ে দেন।[হাদীসটি শাইখ আলবানী সহিহ বলে গণ্য করেন]

১০. মাইমূনা বিনতুল হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহা

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামরত অবস্থায় মাইমূনাকে বিবাহ করেছেন।[হাদীসটি বুখারী (১৮৩৭) ও মুসলিম (১৪১০) বর্ণনা করেন]

'ইহরামরত অবস্থায়' কথাটি প্রমাদ। সঠিক হলো তিনি কাযা উমরা থেকে হালাল হওয়ার পর তাকে বিবাহ করেছেন। দেখুন: যাদুল মা' আদ (১/১১৩), ফাতহুল বারী (হাদীস নং: ৫১১৪)।

১১. সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই ইবনে আখ্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহা

খাইবার যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মুক্ত করে বিয়ে করেন।[হাদীসটি বুখারী (৩৭১) বর্ণনা করেন]

এরা হলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী, যাদের সাথে তিনি ঘর সংসার করেছেন। এদের মধ্যে দুইজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় মারা যান। তারা হলেন: খাদীজা ও যাইনাব বিনতে খুযাইমা রাদিয়াল্লাহু আনহা। আর তিনি নয় জন স্ত্রী রেখে মারা যান, যে ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই।[দেখুন: যাদুল মা' আদ (১/১০৫-১১৪)]

কেউ কেউ বলেন: তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে আরো ছিলেন রায়হানা বিনতে আমর আন-নাদ্বরিয়্যা; মতান্তরে আল-কুরাযিয়্যাহ। বনু কুরাইযার যুদ্ধে তিনি বন্দি হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের জন্য বাছাই করেন। এরপর তাকে মুক্ত করে বিয়ে করেন। এরপর তাকে এক তালাক দেন। পরবর্তীতে আবার ফিরিয়ে নেন।[ওয়াকেদীর সূত্রে ইবনে সাদ (৮/১৩০)]

কেউ কেউ বলেন: বরং রায়হানা তার দাসী ছিল। মালিকানাভুক্ত দাসী হওয়ার কারণে তিনি তার সাথে সহবাস করতেন। ইবনুল কাইয়িম যাদুল মা' আদ গ্রন্থে এই মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

মারিয়া আল-কিবতিয়া-- (ইব্রাহিম জন্মগ্রহণ করেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাঁদী মারিয়ার উদর থেকে। হিজরী আট সালে তাঁর বাঁদী মারিয়া আল-কিবতিয়্যার ঘরে ইব্রাহিম জন্মগ্রহণ করেছে।[যাদুল মাআদ (১/১০৩)] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মারিয়াকে উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিল ইস্কান্দারিয়ার বাদশাহ ও কিবতীদের প্রধান 'আল-মুক্বাওক্বাস' ।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।সূত্র: ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব